বাংলায় লৌকিক পীরবাদ ঃ
স্থানীয় ঐতিহ্য ও লোকধর্মের সমন্বয়

নাজিবুর রহমান মল্লিক

মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলার মুসলিম সমাজ বিশেষত – গ্রামবাংলার লৌকিক সমাজকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায় সেখানে লৌকিক পিরের প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। যাদের প্রভাব শুধুমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এই সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে এ সমস্ত পিরের প্রভাব তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। বাংলায় 'লৌকিক পীরবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে প্রশ্নগুলি আমাদের সামনে আসে সেগুলি হল – পিরবাদটা ঠিক কী, বাংলায় কীভাবে পিরবাদের উত্থান ঘটল, বাংলার গ্রামীন লোকজীবন কিভাবে স্থানীয় পিরদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন মানুষের বিপদে আপদে কিভাবে এই সমস্ত লৌকিক পিরেরা একমাত্র সহায়করূপে বিরাজ করছেন? আর এ সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করতে গিয়েই দেখা যায় যে পিরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মতোই; সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা রয়েছে পিরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারলেই সহজে যে কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আরও একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে বাংলার লৌকিক পিরগুলি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ উভয় ধর্মের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। এই ধারণা থেকেই আমি পিরবাদের সঙ্গে স্থানীয় ঐতিহ্য ও লোকধর্মের সমন্বয়ের সূত্র খুঁজেছি। তবে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, 'পীরবাদ' কোন নতুন একটি ধর্মীয় মতবাদ নয়; এটি শুধুমাত্র গ্রামবাংলার লোকজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি প্রচলিত লৌকিক মতবাদ মাত্র।

পির শব্দের উৎস ঃ

'পীর' শব্দটি 'কোরাণ' বা 'হাদিশে'র অন্তর্ভুক্ত কোন শব্দ নয়, এটি একটি ফারসি শব্দ। পারস্য (বর্তমান ইরাণ) এর অগ্নিপূজক পুরোহিতদেরকে "পীরে মুগাঁ" বলা হত। আবার জ্ঞানী অর্থেও পির শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবে সাধারণত যারা আল্লাহর আউলিয়া বা ওলি অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত প্রতিনিধি, সাধারণ মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পথটুকু বলে দেন তাদেরকেই পির বলা হয়।

এভাবেই 'পীর' শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। এই পিরকে মুর্শিদ বা গুরুও বলা হয়ে থাকে আর পিরের শিষ্যদেরকে বলা হয় মুরিদ। বাংলার গ্রামাঞ্চলগুলিতে বয়স্কদের মুখ থেকে প্রায়ই একটা কথা শোনা যায় পীর বা গুরু না ধরলে অর্থাৎ পিরের মুরিদ না হলে আল্লাহর সান্নিধ্যলাভ সম্ভব নয়। যারা পিরের মুরিদ বা শিষ্য হন তারা অনেকটাই বৈষ্ণবমতে দীক্ষাগ্রহণের মতোই দীক্ষা নেন। এভাবে যারা দীক্ষা নেন তারা সাধারণত মারফতপন্থী এবং বিভিন্ন তরিকা বা পদ্ধতিতে গুরু বা পিরের নির্দেশ পালন করে আল্লাহর কৃপালাভের চেষ্টা করতে থাকেন। অর্থাৎ পির বা গুরু এখানে একজন শিক্ষকের মতোই আল্লাহ ও বান্দা (শিষ্য) এর মাঝে মধ্যপন্থার ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে পিরের ভূমিকা অনেকটা অক্ষর পরিচয় শেখানো শিক্ষকের মতোই – যিনি শুধুমাত্র আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের উপায় বলে দেবেন। যার উল্লেখ পবিত্র 'কোরাণ শরিফে'ও পাওয়া যায় - "প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক আছে" (সূরা আর-রা'দ - ৭)।

পিরবাদ ঃ

'পীর' বলতে মূলত আধ্যাত্মিক নেতা বা গুরু বোঝালেও বাংলার লৌকিক সমাজ সুফি ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতা, মর্যাদাবান, সেনানায়ক, নতুন জমিতে অগ্রবর্তী বসতি স্থাপনকারী, রূপান্তরিত হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী; এমনকি মানুষের রূপে কল্পিত অতিপ্রাকৃত শক্তি ও আত্মা ইত্যাদি সত্ত্বাকেও পিররূপে গ্রহণ করা হত। বাংলার মুসলমান সমাজ পীরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এ সমস্ত সত্ত্বাকে ঘিরে এক ধরনের লৌকিক ধর্ম গড়ে তোলে এবং তাদের জীবনে প্রতিদিন ঘটে চলা নানান ঘাত-প্রতিঘাতে এদের শরণাপন্ন হয়।

আবার পিরের কবর বা মাজার প্রতিষ্ঠা বাংলার বাইরে অন্যত্র দেখা গেলেও বাংলায় ধর্মের বাইরে নানারকম অলৌকিক সত্ত্বার ওপর পীরত্ব আরোপ এক নতুন দিক সূচিত করে। যুগের পর যুগ ধরে এভাবেই নানান অলৌকিক সত্ত্বার অস্তিত্বের প্রতি আনুগত্য দেখানো ও তাদের উপাসনার মধ্যে দিয়ে বাংলার লৌকিক সমাজে এক ধরনের ধর্মীয় রূপান্তর ঘটে। যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামি মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; এটাই 'পীরিফিকেশন' বা 'পীরবাদ' নামে পরিচিত।

বাংলায় পিরবাদের ইতিহাস ঃ

যে কোনও ধর্মের বিস্তারের ক্ষেত্রেই সাধারণত দুটি দিক দেখা যায় - একটি কর্মমুখী দিক, আর অন্যটি হল মর্মমুখী বা মরমী দিক। যেহেতু বাংলার বেশিরভাগ

মানুষ সুফি পিরদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, আর এই পিরেরা ছিলেন মরমী মতে বিশ্বাসী। সুফি পিরদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলায় যারা এই নতুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তাদের বেশিরভাগই ছিলেন সাধারণ কৃষক। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও লৌকিক হিন্দু মতবাদ, বুদ্ধিজম, নাথপন্থা প্রভৃতি লোকাচার ও ঐতিহ্য তাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। তাহলে তারা কেন সুফি পিরদের দ্বারস্থ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল; তারা তো বৌদ্ধ বা নিম্নবর্ণের হিন্দু হয়ে থাকতে পারতো হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের কাছে গিয়ে। এর সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার আনাচে-কানাচে যত্র-তত্র ছড়িয়ে থাকা পিরের থানগুলি লক্ষ্য করলে। বাংলার বেশিরভাগ পিরের থানগুলির ইতিহাস খুঁজলে দেখতে পাব এগুলির সঙ্গে পুকুর যুক্ত আছে বা ছিল এবং আশেপাশে ছিল কৃষিজমি। যেটা আমরা এখনও গ্রামাঞ্চলগুলির পিরের থানের কাছে দেখতে পাই। আসলে তখন সময়টা ছিল নবগঠিত পাললিক ভূমির ওপর থেকে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদী জমি সম্প্রসারণের যুগ। আর এটা মূলত সুফি পির-ফকিরদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল।

বাংলায় পিরবাদের অন্তর্গত যে গুরুবাদ লক্ষ্য করা যায় এটা আসলে বৌদ্ধদেরই দান। 'পীর' ও 'স্থবির' সমার্থক শব্দ। পীরেরা সাধারণত বৌদ্ধদের মতোই গুহ্য সাধনা করে থাকেন। বাংলার মরমী সাধনা তাই গুরুবাদী। আর এই প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বাঙালি মুসলিম গৃহস্থও তাই পির বা গুরু ছাড়া ধর্মজীবন কল্পনা করতে পারে না এবং এটা এখনও সমানভাবে সত্য। যদিও এখন ইসলাম ধর্মে শরীয়তি প্রভাব অনেকটা ছড়িয়ে পড়লেও বাংলার গ্রামাঞ্চলগুলির সাধারণ মুসলিম জনসাধারণের জীবনযাপন বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে আমরা বাংলায় পিরবাদের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারব। বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা পিরের মাজার বা দরগাহ্গুলি প্রতিদিন বা সপ্তাহে একদিন বিশেষত বৃহস্পতি বা শুক্রবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। এখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই পিরের নামে শিরনি দিয়ে থাকেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা বাতি দেওয়া হয়ে থাকে। মুসলিমদের এই দরগাহ্ প্রীতি অনেকটাই বৌদ্ধদের স্তূপ পূজা পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত এবং মাজার বা দরগাহ্তে সন্ধ্যাবেলা বাতি দেওয়ার রীতির মধ্যে হিন্দুরীতি সাঁঝবাতি দেওয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বাংলায় পিরবাদের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বাংলার বেশিরভাগ মুসলিমই ছিল বৌদ্ধ বা নিম্নবর্ণের হিন্দু।

ব্রতকথা ও স্থানীয় লোক ঐতিহ্যের সমন্বয় ঃ

বাংলায় পিরবাদের ধারণায় ব্রতকথা ও স্থানীয় লোক ঐতিহ্যের সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পিরমঙ্গলের গান ও ব্রতকথা গাওয়া হত জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে বনবিবি ও গাজী পিরের উদ্দেশ্যে। আবার নৌকায় করে নদী বা সমুদ্র যাত্রার সময় পাঁচ পিরকে স্মরণ করে 'বদর বদর' ধ্বনি করা হয়, গো-মড়কের সময় মানিক পির, সত্যপিরের গান গাওয়া হয় এবং পিরকে উদ্দেশ্য করে শিরনি দেওয়া হয়। সারাবছর বিপদমুক্ত থাকার জন্য সত্যপির ও মানিক পিরকে স্মরণ করা, সত্যপিরের গান ও শিবনি দেওয়া এখনও গ্রাম বাংলার কিছু কিছু অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষ একসঙ্গে মিলিত হন। এছাড়া বহু প্রাচীনকালেই কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তির জন্য ওলাবিবি, বুড়িমা প্রভৃতি কাল্পনিক পিরের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে এখনও বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অঘ্রান-মাঘ মাসে ওলাবিবিকে উদ্দেশ্য করে ফাতেহা (ভাত ও মাংস) রান্না করা হয়। এই প্রথার সাথে হিন্দুদের শস্যের দেবী লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নবান্ন উৎসবের মিল পাওয়া যায়। এছাড়াও ৫০-৬০ বছর আগে পর্যন্তও মুসলিম রমণীরা ভাসান গান ও মনসার উদ্দেশ্যে ব্রত করত।

তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে গ্রামীণ বাংলার মুসলিম সমাজ কিভাবে হিন্দু রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ব্রতকথাকে আত্মস্থ করল। আসলে দীর্ঘ সময় ধরেই বাংলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বাস করে আসছে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু মহিলারা তেল, সবজি, মাছ, বালা ইত্যাদি বিক্রির সূত্র ধরে মুসলিম অন্তঃপুরে প্রবেশ করে আসছে। তারা জিনিষপত্র বিক্রি করতে এসে দীর্ঘক্ষণ কথোপকথন করত। এভাবেই বাঙালি মুসলিম মহিলারা ভাসান গান, মঙ্গল পাঁচালি, ব্রতকথা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হন।

বিভিন্ন পিরের বৃত্তান্ত ঃ

বাংলায় ইসলামের আগমন থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সমস্ত পিরের সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি আহমদ্ শরীফ মহাশয় তাদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন — (১) ঐতিহাসিক ভাবে প্রসিদ্ধ পির (জাফরখাঁ গাজী), (২) কল্পিত ও অবাস্তব পির (বনবিবি)। এসব পিরের মধ্যে অনেকে সাধারণত আধ্যাত্মিক গুরু বা ধর্ম প্রচারক ও নেতা হিসাবে পরিচিত হলেও অনেকেই ছিলেন যারা আধ্যাত্মিক গুরু বা ধর্মপ্রচারক ছিলেন না; বরং অস্থির ও সংঘাতময় সমাজে নেতৃত্বদানের মধ্যে

দিয়ে পিরের আসন লাভ করেছিলেন। বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন পির সম্পর্কে আলোচনায় এ ব্যাপারে বিশদে জানা যাবে।

গাজী পির —

'গাজীপুঁথি' বা 'কালুগাজী চম্পাবতী' থেকে গাজী পির সম্পর্কে জানা যায়। যেখানে একটি ঐতিহাসিক পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও গাজীর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা দ্বিমত আছে। কেউ বলেন তিনি বিরাট নগরের শাহ সিকন্দরের পুত্র; রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীর স্বামী। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি গড় মান্দারণের গাজী ইসমাইল অথবা ত্রিবেণীর জাফরখাঁ গাজীর পুত্র বড়খাঁ গাজী। যদিও আবদুল গফুর সিদ্দীকি ও গিরীন্দ্রনাথ দাসের মতে তিনি হলেন গোরাচাঁদ পির আব্বাসুদ্দীনের শিষ্য হজরত আবদুল্লা ইলিয়াস সন্দলের বড় পুত্র বড় খাঁ গাজী। কৃষ্ণহরি দাসের রায়মঙ্গল সঙ্গীতে আমরা বড়খাঁ গাজীর সাথে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধের বিবরণ পাই। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্ররূপী বড় খাঁ গাজীর সাথে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধের আরও একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। এখনও সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষজন বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাঘের পিররূপে বড়খাঁ গাজীকে স্মরণ করেন এবং এখানে বড়খাঁ গাজীর নামে অনেক পিরের থানও আছে। যেখানে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষ মিলিত হয়ে বড়খাঁ গাজীর পূজা করেন, শিরনি দেন।

পির জাফরখাঁ গাজী —

হুগলি জেলার অন্যতম সম্প্রীতির পীঠস্থান গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর সংগমস্থল ত্রিবেণীর অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ায় অবস্থিত পির জাফরখাঁ গাজীর দরগাহ্। তিনি ছিলেন একজন মুঘল সেনাপতি। 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ' এর তথ্য অনুযায়ী জাফরখাঁ গাজী মারা যাবার পর ১৩১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নামে একটি সমাধি তৈরি হয় এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও সমাধিসৌধ তৈরি হয় যা জাফরখাঁ গাজীর দরগাহ্ নামে পরিচিত। দরগাহ্র মূল দরজার ডান ও বামদিকে মূর্তি দেখা যায়। দরগাহ্র বাইরের দিকের দেওয়ালে খোদাই করা প্রদীপ, দরজার ডানদিকে মঙ্গলবাচক ঘট আছে। দেওয়ালের গায়ে গায়ে অনেক ভাস্কর্য বা মূর্তি খোদাই করা আছে - যা অস্পষ্ট। এই দরগাহ্টির সঙ্গে অনেকটা হংসেশ্বরী মন্দিরের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতি বছর ১০ ফেব্রুয়ারি দরগাহ্র বাৎসরিক উরশ শরীফে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই উপস্থিত হন, পিরবাবার কাছে মনোজাত করেন, ধূপ ও শিরনি দেন।

মানিক পির —

ইসলাম-পূর্ব ইরাণের একজন সুফি সাধক ছিলেন মানিক। সম্ভবত দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি জরাথুষ্ট ও খ্রিস্টধর্মের সংমিশ্রণে এক নতুন ধর্ম প্রচার করেন। 'মানিক' শব্দটি এসেছে 'মানিকী' (গ্রীক শব্দ - Manikhaios) থেকে। তাঁর বাসস্থান ছিল অধঃপতিত শ্রেণির ঘোষপল্লীতে। তিনি ছিলেন গোরু সহ সমস্ত প্রাণীর রক্ষক। ধীরে ধীরে বাংলায় লৌকিক শিবের সঙ্গে তার তুলনা করা হতে থাকে। আঠারো শতকের ফকির মহম্মদের 'মানিক-পীরের গীত' থেকে জানা যায় যে তিনি হলেন এক বিধবা দুধ বিক্রেতার সন্তান; যার নাম 'দুখিয়া'। কথিত আছে এই দুখিয়া সমস্ত বাধা অতিক্রম করে রাজকুমারীকে বিবাহ করে 'বাইশ লক্ষ পরগনা'র রাজা হন এবং সাধারণ মানুষের ধারণা যে সমস্ত জায়গায় তিনি গোরু এবং গোয়ালাদের রক্ষক হিসাবে উপস্থিত হন। বাংলার গ্রামে গ্রামে ফকিরদের গলায় মানিক পিরের যে গান শোনা যায় তার মধ্যে বিশেষভাবে গো-সম্পদের মঙ্গলের কথা খুঁজে পাওয়া যায়। ড. গিরীন্দ্রনাথ দাসের 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে এরকমই এক মঙ্গলগীতের উল্লেখ পাওয়া যায় —

"কথায় বলে গাই গরুর মুখে দুগ্ধ রয়,
বেশি করে খাইলে গাই বেশি দুগ্ধ দেয়।
চূর্ণি ভূষি খইল-বিচালি ভেলিগুড় আর,
কাঁচা ঘাসে গাইয়ের পেষ্টাই করে দিলাম সার ....
মানিক পীরের চরণ বন্দি পালা শেষ করি,
মুসলমানে আমিন বলে, হিন্দুরা বলে হরি।।"

সত্য পির —

অনেকের মতে সুফি-সন্ত বাগদাদের মনসুর আল হাল্লাজ হলেন মূল সত্যপির। তিনি 'অন-অল-হক' বা 'আমিই সত্য' ঘোষণা করেন। যা উপনিষদের 'অহম ব্রম্ভামি' (আমিই ব্রহ্ম) এর সাথে সম্পৃক্ত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার হিন্দু দেবতা নারায়ণের সাথে সত্যপির এক হয়ে গেছেন —

'হিন্দুর দেবতা আমি মোমিনের পীর
যে যাহা কামনা করে তাহারা হাসিল।'

এই সত্যপিরকে কেন্দ্র করে রচিত গাথা তিনটি অংশে বিভক্ত। যার প্রথম ভাগটি হল ব্রতকথার সাথে সম্পর্কিত আচার, দ্বিতীয়টি হল লোককাহিনী গাথা এবং তৃতীয়টি হল মুসলিম ভাবনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। হিন্দু কবিরা ব্রতকথার

আকারে সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখত; যা স্কন্দ পুরাণের প্রক্ষিপ্ত অংশ 'রেবা' থেকে গৃহীত। এই হিন্দু ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত সত্যনারায়ণ গৃহীত হলেন সত্যপীর রূপে। ষোড়শ শতকের শেষ দশকে যখন চৈতন্য প্রভাবকে নব্যব্রাহ্মণ্যবাদ অধিকৃত করল ঠিক এই পরিস্থিতিতে সত্য পীরের আবির্ভাব ঘটে এবং তাই আমরা 'সত্যপীরের গান' গুলিতে হিন্দু মুসলিম যুগ্ম ভাবধারার সমন্বয় লক্ষ্য করি।

পির জঙ্গলবিলাস —

হুগলি জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত আটঘড়া গ্রামে কানা নদীর তীরবর্তী স্থানে পির জঙ্গলবিলাস এর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রতি বছর রাসপূর্ণিমার ঠিক এক সপ্তাহ পরে এখানে পির বাবার নামে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের এক মিলনক্ষেত্র। হিন্দু-মুসলিম সকলেই মেলায় প্রবেশের পূর্বে পিরবাবার দরবারে ঘোড়া, ধূপ, শিরনি দেন। আর যাদের পিরবাবার কাছে মানত থাকে তারা মানত পূরণ হলে পিরবাবার দরবারে কারিগর দিয়ে তৈরি করিয়ে অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের ঘোড়া উপহার দেন।

পাঁচ পির —

সমুদ্র বা নদী পথে নৌকাযাত্রার সময় নাবিকেরা বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নৌকাযাত্রার পূর্বে পাঁচপিরের স্মরণ করে থাকেন। এই পাঁচ পির হলেন সিকন্দর শাহ্, বদর, কালু, গাজী ও গিয়াসুদ্দিন। মূলত হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে এখনও পাঁচ পিরকে স্মরণ করে ভেলা ভাসানোর পরব অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বড় পুকুর বা নদীতে সন্ধ্যাবেলা ভেলা ভাসানোর সময় সকলে সমস্বরে বলে —

আল্লা, নবী, পাঁচপীর;

বদর; বদর।

এই ভেলা ভাসানোর পরবটি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতি বা শনিবার দিন এবং এই পরবের সময় পাঁচপিরকে স্মরণ করে রুটি ও হালুয়ার ফাতেহা দেওয়া হয়। এই পরবটি ধীরে ধীরে বেশ কিছু অঞ্চলে বন্ধ হয়ে গেলেও মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের বংশধররা এখনও আলোর রোশনাইয়ে ভেলা সাজিয়ে রীতিমতো জাঁকজমক ভাবে ভেলা ভাসানোর পরবটি সম্পন্ন করে থাকেন।

বনবিবি —

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই মাছ ও কাঁকড়া ধরতে, জঙ্গল থেকে গাছ কাটতে, গোল পাতা ও মধু সংগ্রহ করতে যাবার পূর্বে জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে একসঙ্গে বনদেবী বনবিবির পূজা করে তবেই নৌকায় চড়েন। এই বনদেবী বনবিবি সম্পর্কিত বনবিবির গল্পে আমরা বেশকিছু কাহিনি খুঁজে পাই। কথিত আছে যে দক্ষিণ রায় দুখে নামক মধু সংগ্রাহকের কাছ থেকে সাত নৌকা ভর্তি মধু উপহার চান। তখন দুখে মা বনবিবির শরণ নিল। এরপর শুরু হল বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণীর যুদ্ধ। যুদ্ধে হেরে নারায়ণী বনবিবিকে 'সই' বলে সম্বোধন করলেন।

'রায়মণি সই বেটা হইল তোমার'।

এরপরই মাতৃস্বরূপা বনবিবির পুত্ররূপে দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাজী ও দুখে একে অপরের ভাই রূপে মিলিত হল। এভাবে বনদেবী হিসাবে বনবিবি হিন্দু-মুসলমানের কাছে পরিচিত হলেন। মহম্মদ খাতের ও বয়নুদ্দিন রচিত 'বনবিবি জহুরনামা' কাব্যে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে পারি।

বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে মধ্যযুগে প্রধানত সুফি-দরবেশদের হাত ধরে। এই সুফি-দরবেশরাই স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বদানের দ্বারা গ্রাম বাংলার লৌকিক সমাজে ক্রমশ পিররূপে পরিচিত হতে থাকেন। আসলে মধ্যযুগ ছিল ধর্মসমন্বয়ের যুগ, তাই মধ্যযুগের চৈতন্য ভাবধারাও বৈষ্ণবধর্মের মতোই গ্রাম বাংলার লৌকিক পিরেরাও প্রচলিত সংস্কার, লোকবিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে।

গাজী পির, পির জাফর খাঁগাজী, মানিক পির, সত্যপীর, পির জঙ্গলবিলাস, পাঁচ পির, বনবিবি প্রভৃতি লৌকিক পিরের বর্ণনায় কল্পনা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় অনেকাংশেই গ্রাম বাংলার বনবিবি বা সত্যপির বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মনে জায়গা করে নিয়েছে। যার প্রমাণ এখনও আমরা গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সত্যপিরের গান, বনবিবি, গাজী পির, মানিক পিরের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করতে পারি। যেহেতু এগুলি ইসলামি শরীয়ত সম্মত নয়, তাই ইসলামি জীবনধারায় বর্তমানে শরীয়তি ভাবধারার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তারিত হবার ফলে এই সমস্ত লৌকিক পিরের থান রক্ষণাবেক্ষণের অভাব দেখা দিচ্ছে এবং পিরের নামে প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে কমতে কমতে বন্ধ হয়ে যাবার মতো পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

বাংলা

১. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), নয়া উদ্যোগ, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০১১।
২. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, সময় প্রকাশন, ১ম প্রকাশ নভেম্বর, ২০০০।
৩. আহমদ শরীফ, বাংলার সুফি সাহিত্য, সময় প্রকাশন, ১ম সংস্করণ মাঘ, ১৩৭৫।
৪. ড. সুমঙ্গল রাণা, ষোড়শ শতকের বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্য, অঞ্জন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৬০।
৫. ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, শহিদ লাইব্রেরি, ১ম প্রকাশ ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৬।
৬. ড. ওসমান গনি, ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি, রত্নাবলি, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।

পত্র-পত্রিকা

১. কৌলাল অনলাইন ম্যাগাজিন, ২ মার্চ, ২০১৯।
২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ মার্চ, ২০১৭।

English

1. Sushil Chaudhury, Identity and Composite Culture: The Bengal Case, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. 58(I), 2013.
2. Sutapa Chatterjee Sarkar, Life Literature and Folk deities in the Mangroves, Nehru Memorial Museum and Library, 2013.

সাক্ষাৎকার ঃ

	নাম	লিঙ্গ	বয়স	ধর্ম
১.	সেখ সামিউর রহমান	পুরুষ	২৭	ইসলাম
২.	সবিতা মৃধা	মহিলা	৫৮	হিন্দু
৩.	অসীমা দে	মহিলা	৪২	হিন্দু
৪.	মহম্মদ মিনহাজ উল-আবেদিন	পুরুষ	৩৭	ইসলাম
৫.	তপন মৃধা	পুরুষ	৬০	হিন্দু